Ba... Library

PREFACE.

"I asked for several men I had known well here. Many of them were drowned and the tales of the survivors were pitiful. Wealthy Talukdars were wandering about aimlessly. One man who had 12,000 *aris* of paddy (about 2850 maunds) in his godown had been drowned with all his family, a large one. Nothing was standing of his houses, even the mud plinth had been washed away, and the clods lay strewn over the neighbouring fields. The only remnant of the once comfortable homestead was the timber posts, on which the godown had stood. In this village as in Raja-khali, Ujantia, and Pekua, there are very few men surviving, and practically no women or children. There is therefore, but little present need of relief."

DIARY OF MR. C. G. H. ALLEN,
Settlement Officer, Chittagong,
Ajent the Chittagong Cyclone
of the 2nd October, 1897

ভানুমতী।

প্রথম অধ্যায়।

কমলে কামিনী।

শরৎ কাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুলকিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লবসমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎশষ্যক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকাননশোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা মুহরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির

কল্পনাতীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে কুতুবদিয়া, মহেষখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তর-প্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগন-স্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেষখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তূপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা সুবর্ণদ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীরসংলগ্ন বজরার-ছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণহৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন,—

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু ; সুনীল সলিলরাশি,
রবির সুবর্ণ-করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে, দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর !

খেলিছে তরঙ্গমালা,—শিরে ফেনপুষ্পরাশি,—
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয়-সিন্ধু, তরঙ্গ-অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে, ভক্তিপ্রপূরিতহৃদয়ে, এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তি-সম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া, সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গভঙ্গে যে ফেনরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমলকানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলবনে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেইরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল। তিনি তখন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সিন্ধুতীর মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধু-নিনাদ প্লাবিত করিয়া, স্থানীয় কবি ৺শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন,—

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি' করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম! এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টা—স্পষ্টতরা হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন,—

কিশোরী বালিকা সোনার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,

হেলিছে দুলিছে উঠিছে পড়িছে
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি!
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে, পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরী-আগা উঠিল আকাশে,
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি'
চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী-পাছা উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
পড়িল সরিয়া কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি।
আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত
উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র-অনিলে
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাত লীলাময়ী অলকায়,

শারদ রবির প্রভাত কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু শূন্যে তুলি দেখে তার মুখ,
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে আদরিণী;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী"!

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশি বাজিতেছে; কণ্ঠ এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী। মরুসদৃশ সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরীমূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী

নাচিতেছে, এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে। সাগরানিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,
(তা কি তুমি জান না হে ?)
আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী "কমলে কামিনী"।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুক্তকেশী।

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গাপ্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু' জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস ? অন্ধ কি সাধে ! বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না ? আর কোথাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব ? লাগা নৌকা দক্ষিণদিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকা উত্তর দিকে লাগাইতে বলিল।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে ! ওঁদের হুকুম মত নৌকা লাগাইতে হবে !

"কি ! থাক্ মাগি !"—বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতেছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,— "আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছিস্। অন্ধ আর কাহাকে বলে ?"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি, না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম? আমি বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা' পুতিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল,—"এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়। আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার। হা ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার জিহ্বা বিষ, আর সকলের জিহ্বায় অমৃত।"

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ প্রহার করিল,—"লক্ষীছাড়ি! আমার খাস, আমার কথা শুনিস না। আমি বলিলাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, তুই দক্ষিণ দিকে লাগাইলি কেন?" বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে,—

'ছহির' মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। বজরার মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল।—"উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেলা করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি; দিন রাত্রি অষ্ট-প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না। আমার সোনার শরীর মাটি হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায় বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার টিপ্পনী করিয়া বলিতেছেন,—"খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই। মেয়েটি সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়।"

পতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না; মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল।

দাম্পত্যপ্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজরা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"হাঁ।

হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল,—"দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদেনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল,—"বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন আবার জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"তুই আবার আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসিনি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, দুই টাকা দেয় ত খেল্‌ব।

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন দিবেন না? তখন সে মধুর কণ্ঠে "এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক বালিকা দুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে

নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরাবাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূৰ্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীতময়; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। এক একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের জন্য আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন চরণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু ঊৰ্দ্ধে দুই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে, কখন বা দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সরাইয়া

নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। অনাথনাথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বেদিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া, কখন এক পা, কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালম্ব নিরাশ্রয়-ভাবে দীননয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কখন সে চিৎ হইয়া ক্ষুদ্র দেহলতাটিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া, এবং বক্ষের উপর শিশুটিকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র দুয়ানি গোলাপসন্নিভ অধরোষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখানি দেখিয়া, অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উছলিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতেছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতরদৃষ্টিতে দেখিতে-ছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ পরে সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে বাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা

প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর বাহির হইয়া আসিয়া সন্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বনবিহীনা,
মুদ্রিত নীলাব্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত,
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।
কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
সন্ধ্যার রক্তিমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
অবশ যুগল কর পড়ি অযতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হ'তেছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।

কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে।
মেঘাচ্ছন্ন সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন,
গাম্ভীর্য্যপূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
সোনার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত।
নিরাশ্রয়া, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,
ভাসিছে নিশ্চল মুখে দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে।
শিশুটি সে মুখ পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল,—"ভানুমতি!"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনাথা।

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল। শরৎকালে এমন গ্রীষ্ম কেহ কখনও অনুভব করে নাই। সে উত্তাপও কেমন এক রকমের। প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্ব্বাত-নিষ্কম্প ভাব। বসুন্ধরা যেন কি এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতপ্ত বাষ্পাকীর্ণা। সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে মেঘ হইতেছিল। বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল, এবং কেমন লিক লিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। তিনি সেই ঋত্বনুচিত গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াই একটি দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এখন এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। অতএব এই মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বেদেনী নৌকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া, ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া রহিয়াছিল, সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই, কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই অপরাধে নৌকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—"পোড়ামুখি! দেখিলি না বাবুটি বোকা। ॥৹ গণ্ডার জায়গায় ২৲ টাকা দিল, তাহার উপর আবার ২৲ টাকা বকসিস্। চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা না হইলে কি বাজি দেখিয়া চখের জল ফেলে?" এই বলিয়া তিনি আবার শয্যা লইলেন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া খাদ্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুঝিল, বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন সাদরে বালিকাকে বলিল—"মা! তোরা যা। আমি বাজার করিতে যাইতেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২৲টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।"

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে স্নেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহারা শুনে নাই। তাহারা আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, "ইনি কি মানুষ?" তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জ্যোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের একটি পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালের প্রভাতকিরণমণ্ডিত কুসুমরাশি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ, এবং সর্ব্বশেষ তাহার সেই মধুর কথা! সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচিত্রের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া

বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু চিরপরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম!
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।"

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে দুটিকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত। এই দরিদ্র দেশে প্রজা-ভূম্যধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল। এখন জটিল আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও, এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বুনিয়াদি জমিদারে, দৃষ্ট হয়।

বালকবালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমার নাম কি ?”

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে ?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে ?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর

শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার পত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

বালিকা। কি গাইব বাবা?

অনাথ। তুমি কি কীর্ত্তন জান মা?

উত্তর। জানি।

বালিকার 'বাবা' সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার 'মা' সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রিত হইয়া গেল। বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কবি ত্রিপুরাচরণ রায়ের একটি গীত গাইতে লাগিল,—

১

বাছা রে জীবন-জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধে দি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোঠের বেলা ব'য়ে গেছে।

২

বেণুর স্বরে ডাকছে বলাই,—
আয় আয় আয় রে কানাই,

তুই বিনে যে যায় না রে গাই!
তোর পানে চেয়ে আছে।

৬

বাছা রে! তোর মার মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে প্রাণ যায় না রাখা,
তোর মুখ চেয়ে বাঁচে।

মাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রু-জলে ছল ছল করিতে লাগিল। অনাথনাথ বলিলেন,—"তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকর স্বর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

ইত্যাদি।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গীত শেষ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ গীত যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃপ্রাণে মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতিপ্রদান করিত। তিনি বলিলেন, "মা! তুই শ্যামা বিষয়ের গান জানিস?" বালিকা এক একবার তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

"মা! আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা! ডেকেছি।
চিরজীবন পাষাণীরে!
ভাসালি আঁখি-নীরে,
চিরজীবন দুখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলি না;—

মা-হারা শিশুটির মত,
কেঁদে বেড়াই অবিরত,
নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,
যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক, অনেক দুঃখ সয়েছি।”

বালিকা তাহার করুণকণ্ঠে ভৈরবীরাগিণীর চিত্তদ্রবকরী মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া “মা” বলিয়া গাইতেছিল। অনাথনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল্ল-কোকনদসন্নিভ কপোল বহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—“মা! আমি তোর মা। আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, তুই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।” বালিকাও কাঁদিতে লাগিল।

অনাথনাথেরও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশু-টিও সজল চক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিল,—“মা! তুমি দিদিকে লইয়া যাও। দিদির বড় দুঃখ। দিদিকে মা বড় মারে।”

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশু-টিকে বক্ষে লইয়া সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"হারে গোপাল! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি?"

উত্তর। পারিব। তুমি ত আর মার খাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে।"

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

"গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে!"

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন,—"সত্যি মা! তুই যাবি?"

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, "মা"—সেই মা সম্বোধনে সে কি মধুরতা, কি প্রাণের আবেগই ঢালিল! বলিল,—মা! এমন করুণাসাগর দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণসেবা করিব, অভাগিনীর

পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?"

অনাথনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! বাজিকর অন্ধ!"

বালিকা বলিল, "অন্ধ। অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।"

চতুর্থ অধ্যায়।

রণরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত!
অল্প অল্প বৃষ্টিধারা; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধারা;
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।

স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছু বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, "হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।" অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "হাঁ বাবা! তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড় দুঃখ।"

কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাতকুলশীলা একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি উপস্থিত জীবন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েরই পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরের বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে, বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?" সে উত্তর করিল,—"না"।

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড়

প্রসন্না হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, তাহার ছেলে মেয়ের উপর বোকা বাবুটির একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল। তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"আহাম্মকের কথা শুন? তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তার পর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি এমন কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে—

বাবু বিশ্বাস করিবেন না। 'আহাম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তখন সে বলিল,—"বাবু! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা। এই যে চোখ দেখ্‌ছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তাহাতে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব স্বামীর। তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া কাল হইয়া গেল।" ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।"

একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে

নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ার-মুখী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাঁটার চোটে পরিচয় লইব।”

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন,—“যাইও না, ব’স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দু’বার মারিয়াছ।”

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া, সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল,—“মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্যে আমার যেখানে সেখানে গঞ্জনা।” বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, এবং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনী যে পোড়া-কপালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না হ’লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—“তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক; মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে। তোমরা

টাকা চাও দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। বাড়ী ঘর করিয়া দিব,—তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া, এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।"

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত! অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদগদকণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও বড়মানুষ করুন! বাবুর সোনার কলম রূপার দোয়াত হউক!" তাহার আর বাক্য সরিল না।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল। সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—"ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন। কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব। আমি লাখ

টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্রী নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"বটে! তবে আমি তোকে লাথ টাকা খাওয়াইতেছি। তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

বেদেনী এত ক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল,—"বাবু আপনি বড়লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা,—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ঢের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন; কারণ, মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব।"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্মেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা একবার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপরে অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এত ক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালি-

কাকে এই পিশাচীর হস্ত হইতে যেরূপে হউক উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণবেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা আগতপ্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি দিবেন বলিয়া, বেদেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,— ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।" তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাঁহার নৌকায় বসিয়া আকাশ ও সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত একটি গীত গাহিতেছে।

১

কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিণী!
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্লাবে শ্যাম অঙ্গ,—শ্যাম-অবনী!

৩

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ।—মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,

চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা! ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরা,
অট্ট হাস কি উল্লাস,
ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি', সৃজিলে মানব, জননি!

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা! আসি
নাচ, রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি',
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড—দ্বেষ,
নাশি', কর সুর-রাজ্য অবনী।

———

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্গা।

অপরাহ্ন ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবাত্যা (cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, এরূপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? এরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া লইতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন,

কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড়বেগ তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকাগর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই—এই ৩টা ৩৷০টার সময়ই,—প্রায় চারি দিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাঝিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বলিলেও

চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে, কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে, এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃতঅবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল,–"বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল,—"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা-বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে

বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্রসহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া কাছারিস্থ ভৃত্যদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা ভানুমতীর জন্যে। তিনি বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা দুটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই সহাস করিল না। এক জন বলিল,—"কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন্ কালে সে ছোট নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—"কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?" তিনি প্রকৃতই আত্মাহারা হইয়াছিলেন।

তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ছুটিলেন ; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গণেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল, কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার, ঘোরা নিশীথিনী,
যেন অপরাহ্ণ হইল আমার ;
অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরববিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত ;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।
ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন ;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,

ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি!
যেন ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী কালী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর অট্টহাসি।
ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে উঠিছে জ্বলিয়া
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধার যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ,
পর্ব্বত-প্রতিম কি তরঙ্গমালা
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন!
ঝটিকার সনে যেন মহাসিন্ধু
মাতিয়াছে মহা প্রলয়-আহবে;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,

গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণযষ্টি মত;
পড়িছে অসংখ্য রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া;
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাথাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর ঝটিকা-গর্জ্জন,
গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত;
গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথ-নাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি ভীমকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টিসংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ। সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত, তাঁহারই অসি-প্রহার। তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া, অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, উহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধারা তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথ-নাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত হইয়া, তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোক-রাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথ-নাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্জলিত গৃহাগ্নিতে মোঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে।

স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল। ৬টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারী-ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য-বৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া, যেন বল-সঞ্চয় করিতে একটু বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহ জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্যে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে, এবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে,—দক্ষিণ

দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে—অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অন্যগৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুই এক খানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন; আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরবনিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও "হা ঈশ্বর! হা আল্লা!" রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কার আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্মরক্ষার

জন্যে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। তাহাতে আবার রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোকে পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে এক খানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরমাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে

লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিমসমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ তালু শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্কি! গর্কি!" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্টাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাট

শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বাম হস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি আমার পুত্রটিকে রক্ষ কর, আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।" এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"বাবা! ভয় নাই, তুমি মাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা'?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল। নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রণক্ষেত্র।

চৈতন্য লাভ করিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহার উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে ধীরে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলেন। কর-পদ সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, কর্দ্দমাবৃত দৃঢ়ভূমি। একি সমুদ্র বেলা, না সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও চূড়াভূমি? তখন আকাশ নির্ম্মল। সেই ঘনঘটার চিহ্নমাত্র নাই। কদাচিৎ কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ নীল-সমুদ্রের চড়ার মত দেখা যাইতেছে। সেই ঘোর ঘূর্ণঝটিকাও নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার আর্দ্র দেহে দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আছে। নক্ষত্রের অবস্থান অবলোকন করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। চারি দিক শান্ত, স্থির, নীরব—নিশ্চল। অনাথনাথের আবার ভানুমতীর সেই গীত মনে পড়িল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী !"

সেই তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি! অনাথনাথ সেই ভীষণ ঝড় ও সেই ভীষণ দৃশ্যসকল তবে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন? না;—তিনি উলঙ্গ; পত্নীপুত্রহারা; অজ্ঞাত স্থানে নিপতিত ও শীতে কম্পিত; স্বপ্নই বা হইবে কেন? তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় মা! তোর এ কি বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন! সেই ঘূর্ণবাত্যার পর এই শান্তি! সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মৃদু হাসি! সেই ঘোর উল্লম্ফনের পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তির পর এই মোহিনী রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতিপ্রাণা পত্নী এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রটিকে গ্রাস করিয়া তোর মোহিনী শোভা দেখিবার জন্য কি হতভাগ্য আমাকে জীবিত রাখিলি!" তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুক্ষণ এরূপ ভাবিলেন। সেই রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় নাই, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকক্ষণ তাঁহার হৃদয়েও যেন ঘূর্ণবাত্যা বহিল। অনেকক্ষণ রোদনের পর সেই বাত্যা বর্ষণ শেষ হইয়া হৃদয় কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি যেরূপ রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্র সহ সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতাও

ত রক্ষা পাইতে পারে। এই ক্ষীণ আশার সঞ্চারে হৃদয়ে ও দেহে ক্ষীণ শক্তিরও সঞ্চার হইল। তিনি চারি দিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। এ সকল কিসের আলোক? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক? সিন্ধু-সৈকতে তরঙ্গাভিঘাতে লবণাম্বুকণারাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন করে, একি সেইরূপ কোনও আলোক এই ঘূর্ণঝটিকার পর সমুদ্র-গর্ভে কিংবা সৈকতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে। ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে? তাহা-দের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে

বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃত মানবদেহ। এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো, মহিষ, ছাগ, পালিত পশু-পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র ক্ষীণকণ্ঠে রোদনব্যঞ্জক চীৎকার উঠিল, কণ্ঠ স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" উত্তরে একটি যবনী নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?" অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না।" তখন "হা আল্লা!" বলিয়া রমণী একটি বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোক-ধারাকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া

যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের "বোঁধা" * জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২।৩টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী, বাটি ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃতদেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তস্কর নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন্ স্থান ?" সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখছ না, তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে এক শাশুড়ী পড়ে আছে।" এই বলিয়া সে একটা কর্দ্দমাক্ত স্ত্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোনার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিলে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বাঁধা, এ অঞ্চলে বোঁধা বলে।

করিলেন। সে হাতের “বোঁধা” ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েক জন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হত-ভাগিনীকে মা! মা! বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বোঁধার আলোকে খুঁজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতেছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,— “আমি কোথায়”, কেহ “আমার পুত্র কোথায়”, কেহ “আমার পতি কোথায়?” তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, বসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অন্য দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা অপহৃত বস্ত্র লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঁধাও জ্বলিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাষ্ঠের উপর অবসন্ন অবস্থায়

বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বালিকার গীত যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ-না নয়নে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী !"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহখণ্ড ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর সরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, সমস্ত স্থানে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল নর, পশু, পক্ষীতে এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায়

বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটিকাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি! এ কোন্ স্থান?" বৈরাগী বলিল,—"বাবা! এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"চম্বল!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চম্বল।"

সপ্তম অধ্যায়।

প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র।

স্বর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল ফেনিল দিগন্তপ্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেষ-খালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্ব্ব-তীরে চম্বল-গ্রাম। ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্ব্বে চম্বল-গিরি-মালা। অনাথনাথ তবে কি সেই স্বল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গে এত দূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? এত গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিলেন? তাই তিনি চম্বল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকাতাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া এরূপে গিরি-পাদমূলে পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে। একি স্বপ্ন? একি কোনও অপদেবতার খেলা? একি আরব্য-উপন্যাস? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ,

তাহার মুখে গ্রামের পরিচয় কি বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাহা কেমন করিয়া হইবে? ঝটিকাবিধ্বস্ত হতভাগ্য নরনারী, বৈরাগীকে যে এখনও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চম্বল শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভিভূত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বহুবিস্তীর্ণ শবক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয়স্বজনের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেষখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অদ্ভুত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমমণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিতনয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃপাসিন্ধো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ রক্ষা কর নাই?" দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, উষালোকে,যাহা আরও স্ফুটতর হইয়াছিল,

এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা–
আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে
ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে
শ্যামশস্যসমাচ্ছন্ন, ছিল সুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—
রজনী-প্রভাতে এবে—বিস্তীর্ণ শ্মশান!
নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের;
যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—
শবাকীর্ণ প্রেতভূমি, মহারণভূমি!
শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে!
সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব!
শরতের শস্যক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—
সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি!
পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,
কীট পতঙ্গের শব; শব সংখ্যাতীত
শস্যক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে।
ভগ্নগৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,
ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—

কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে !
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
বিজড়িত ডালে ডালে বিচিত্র বসন
পাদপের, শোচনীয় কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত—
শবরাশি অগণিত, শব অজানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে !
যেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে
গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই সমুদ্র-প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,
জালে যেন মৎস্যগণ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি তিল স্থান নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময় !
কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,
মাতৃস্তন শিশুমুখে; কোথাও পড়িয়া
শিশু ভ্রাতা ভগ্নী দুটি গলায় গলায় !
গলায় গলায়, বুকে বুক, মুখে মুখ,

পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী ;
কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী !
কটিসহ দৃঢ়াবদ্ধ পত্নী সহ পড়ি
কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল।
হায় ! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেয়সীর, এইরূপে আপনার প্রাণ
করিয়াছে বিসর্জ্জন ! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছ নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা দুই ভুজলতা !
রমণীর কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে হায় ! যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্‌ ! মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেমমূর্ত্তি মত

নগ্ন, কৰ্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন নিমেষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর-চিন্তাতীত!
মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার
বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর!

অনাথনাথ এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায়, কি জন্যে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্ত্তের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন! স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া নগ্নের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। শবস্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা জীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মুমূর্ষুকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও

চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহাশ্মানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। কোথাও একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই;—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটীর শেষভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গড়ে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৪। ০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত পত্নী,

পুত্র, মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—"হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথ-নাথের মত জীবিত আছে, তাহাদের কেহ বা জানুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় আত্মহারা জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অন্য জীবিত জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত লোকের মত যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ

তাঁহার পত্নী, পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে। শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ডসকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রণে দেখ না নয়নে নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভানুমতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাবপূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারৌদ্রী প্রলয়কারিণীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোরা ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি

সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই শান্ত সায়াহ্নে সমুদ্র-নিনাদে মিশ্রিত সমুদ্রানিলে বাহিত সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্মুখে বেদের ক্ষুদ্র পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ভগবতী।

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা-মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে, কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাসা কাপড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাস কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাইতেছে—

> দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
> লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
> সদা শিব উর্দ্ধগ্রীব,
> দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া গেল। কিছু ক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালী পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ ভাই! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।"

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও! তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশাইল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধুনিনাদমাত্র শুনা যাইতেছিল। আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু-কণ্ঠ তাঁহারই শিশুপুত্র অমিয়ের। তবে আমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ্রু-নয়নে বলিলেন,— "তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর যেই ধ্বংস-ক্রীড়ায় মহা-মহীরুহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে

তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস্! দয়াময়ী মা!” অনাথনাথ কিছু ক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার হৃদয়ের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।— শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

“দিদি! সত্যসত্যই আমি কালী-মার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?”

বা। হাঁ অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মানুষ মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, তোমাকে কখনও মারেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে

সেই মা? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনি আদর! তুই আমাকে কত আদর করিস্!

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "না ভাই! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভগ্নীর বুকে কত ভাই মরিয়া রহিয়াছে?

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু-নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার স্বর্গসম বুকে লুকাইল। বালিকা গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই! দেব-শিশু! তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালকবালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনীধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি

বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে,—'আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, মিশিতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মিতেছে, চলিতেছে, মরিতেছে।' এ সমুদ্রের কত শক্তি! কাল দেখিয়াছ, কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—"দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র ; তোমার শক্তি, তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়, লীলাময় হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।"

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাঁহার পূজা হয়?

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী! তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ

সাজাইয়াছিলে! আমাকে কি তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ, তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—"তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেবশিশু ছিল না। সে যে গরীব দুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী দু'জনে সুন্দর সংকীর্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি!" এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

শিশুর মুখ গম্ভীর হইল। সে অনেক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না?" শিশু কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণরুদ্ধ অশ্রুধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, "হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ ঢালিয়া বৃথা না ডাকিয়া থাকি, তবে

অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। অমিয়! আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।”

“মা!”—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে গিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন,—“মা ভগবতি! তুই আমার অমিয়কে রক্ষা করিয়াছিস্, এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা করিয়াছেন।”

বালক বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“বাবা!” যে এরূপ মহাপ্রলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায় নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে বক্ষে লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। বালিকা সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুশীতল কৃতজ্ঞতাবারি তাঁহার চরণকমলে ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতেছিল। কিছু

ক্ষণ উভয়ে নীরব। শিশু যেন কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃদর্শনজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার গাঢ়তর মেঘ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণ-কণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! মা—কোথায়?" প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ধৈর্য্যের বন্ধন ভাসাইয়া তাহার সমস্ত দিবসের রুদ্ধ-শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিল। বালক মুখ ফুটিয়া আকুল-হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমাদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা আমি দিদির কোলে যাইব। হাঁ বাবা তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।"

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলি-লেন, "বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।"

শিশুর মুখে, তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল-নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সান্ধ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সেই অবর্ণনীয় অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?"

অ। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশ আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি। বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা

বসিয়া হাসিতেছেন। আমাকে "অমিয়! অমিয়!" বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই যাত্রার প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারি দিকে গায়িতেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর বাবা! আমাদের বাড়ীর রাসের সেই কৃষ্ণ বসিয়া কি সুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন! মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। মা! মা!

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর —বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা!" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,— "উঃ! বুকে বড় ব্যথা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে, ঝটিকা-প্লাবন-সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,— "দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গায়িবি? আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও

তোর সঙ্গে গাইব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয়ও তাহার অমিয়পূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল ;—

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা-পুত্রের এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণদ্রবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রস্ফুটিত কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত শ্লথ হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে, চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না। শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে, চলিয়া

গেল। অনাথনাথ ভূতলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

নবম অধ্যায়।

মহাশক্তি।

অমাবস্যার ঘোরা কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী প্রকৃত নৃমুণ্ডমালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহার-কারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। শ্মশানবাসিনীর পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃত মহাশ্মশান বুঝি আর কখন সজ্জিত হয় নাই। সমস্ত বঙ্গদেশ সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান! আনন্দ-আলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা! তুই উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনাসম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ

তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিনশ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশী-রবের মত "বাবা!" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধনে যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা!" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন! সেই মুখে সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ, কি শোক! অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল,—এ বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা আবার "বাবা" বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন,—"কি মা!" বালিকা বলিল—"বাবা! আমি চলিলাম। আমি ২।১ দিন পরে আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্যে একখানি নৌকা লইয়া আসিব। তুমি চম্বল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চৎ বিশ্রাম কর।"

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"হায়! মা! অমিয় কি আর বাঁচিবে?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

ভা। উঠে। লক্ষীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতী-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা! সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া-ছিল, আমি এ সমুদ্র সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যুৎবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদে-

রমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া পথ চলে, ভানুমতী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, দু' হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে।* এ শক্তি ত মানবীর নহে! এ কি তবে সত্য সত্যই সেই "কমলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই ক্রোশব্যাপী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্ণে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশেখরসানুস্থিত দেব-মন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত ৺ শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাজাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। গৌরদাস দেহত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদি-নাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে কথাটাতে কি এক

* "Mohabat Ali of Tafalier Char in Kutubdia (I can not refrain from putting his name in record) was washed from his home across the Kutubdia Channel to Chhanua. He spent the whole of the next day in Swimming back to the Island with the help of a plank."

শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল। সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সে বেদে-বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসিভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও ৺পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মত রূপ-গুণ-বুদ্ধি-কৌশলসম্পন্ন রমণীরত্নকে দেখিলেই ঘড়া ঘড়া টাকা দিবেন। অতএব উভয়ে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজি করিতে করিতে 'সোণাদিয়া' হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু সহ অবলীলাক্রমে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটি বিশাল পার্ব্বত্যপাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চ চূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অৰ্দ্ধ-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা
অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ণ-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বুর।

উত্তরে ধূসর সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
স্থপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের ;
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
গিরিশ্রেণী তরঙ্গিত শোভে চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু; শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গি আদিনাথের পবিত্র চরণ।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত-মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর!—সিন্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ন-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে! স্থান, কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা, সম্মুখস্থ মহাযোগী,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়-

শৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় শঙ্কর পুরী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ, এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল। সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে আর হয় না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে।

তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মেও বিঘ্ন হইবে।

ভা। আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা বাবা! কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতনধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে। যে আসনে পূজ্যপাদ ৺ গোমতীবন ও রত্নবনের মত মহাযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মোহন্তরাই বসিয়াছে! ইহারা ত মোহন্ত নহে মোহান্ধ! ৺ গোমতীবন ও রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০৲ টাকা। তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত হইত। তাঁহারা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী 'আস্তানে' কৌপীনমাত্রপরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিতকলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেব-

সেবার্থ যথা ইচ্ছা 'প্রণামী' প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান মোহন্তগণের ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যাত্রিগণ এ মোহন্তগণকে প্রণাম করিয়া 'প্রণামী' দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধাম 'রেলওয়ে' পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এত কাল 'কর' বা 'টেক্স' আদায় করিতেছিল। মহামান্য হাইকোর্ট সেই ঘোরতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্ম-সেবায় নিঃশেষিত হইতেছে। দেব এবং অতিথি সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলি পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে এ দেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল,

আগান্ধার চট্টগ্রাম, এরূপ প্রগাঢ় শান্তি, যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্মরাজ্যের পর, ভারত আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরমব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূল নীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন; যত দিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, তত দিন তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের

পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন; হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে। মহাঝড়েও অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্মে ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিকশোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে শস্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার না করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই ঊষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ত্ব,

তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব, এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম, কোনও এক জন অবস্থাপন্ন শিষ্য অম্লানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না, কারণ কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামী! তুমি কি এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বুঝি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এই অধোগতি দেখিয়া বুঝি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বুঝি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল!

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গলদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিল, —"বাবা! ইংরাজ রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। দস্যু তস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা দেববিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে? তাহাদেরও অন্য চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ

রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে,—"রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্পাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দরিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্য দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থবল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্ব্বস্বান্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী

মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোন উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর তাহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের আবির্ভাব হইয়াছে, এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্যে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই; না করিতে পারে, এমন পাপ নাই; না জানে, এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচাশয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। কোনও পুণ্যবতী সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া

এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে!

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা! তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

দশম অধ্যায়।

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে এ অঞ্চলস্থ কর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারাবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্স্‌বাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে, বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান দশ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রুসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পর্ণগৃহমাত্র নাই; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহা মহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলিস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং

বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্যদ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী স্বর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্রসর্ব্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তি ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্মেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সৎকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি শবে দ্বীপাবলী ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ

লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে, এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চিরস্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত দুর্ব্বল প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপখনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্‌সন সাহেব (Dixon) পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভরেতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ন। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে

ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ন-রবি-করে তরঙ্গিত তরল স্বুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এত দিনে আমি বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গমগ্ন হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণ-হৃদয় কমিশনার কলিয়ার সাহেব (F. R. S. Collier) একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি,—এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেবপ্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ম্মাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদেহের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে

কত বার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চিরপ্রসন্নতা। ঐ দেখ, পাদুকাশূন্যপদে কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমানকাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর

এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত। তিনি যেমন তীক্ষবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও মুখে রুক্ষভাব শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের নিকট প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুক-দার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুক-দারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবর পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষের দান-ভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইহার পর আমাদের প্রিয়ভাষী

কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথ-নাথের সঙ্গে অভিবাদনবিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"একটি লোক কতক-গুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

অ। সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে, এতদিন অর্দ্ধেক হিন্দু গ্রীষ্টান কি মুসলমান হইত। এখনও ব্রাহ্ম-সমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন।

সাহেব। আচ্ছা বাবু! ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ও হিন্দু ধর্ম্মে বিভেদ কি?

অ। কিছুই না। হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চতম শাখাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে ব্রাহ্মরা এক লাফে সে শাখায় উঠিতে চাহেন। অষ্টম-বর্ষীয় শিশুও একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং বলিলেই ব্রাহ্ম হইল। হিন্দুরা বলে, গোড়া বাহিয়া বৃক্ষের আগায় উঠিতে হইবে।

সাহেব। হিন্দুরা কি পৌত্তলিক নহে?

অ। না। পৌত্তলিক শব্দ হিন্দুদের অভিধানে কি ভাষায় পর্য্যন্ত নাই। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। পরম ব্রহ্ম মানব ইন্দ্রিয়ের, বাক্য মনের, অতীত। তাঁহাকে কেবল তাঁহার শক্তির দ্বারা ধারণা করিতে পারি। হিন্দুরা এক একটি শক্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া সেই সেই শক্তির পূজা করে। অদ্ভুত জ্ঞান ও কবিত্বপূর্ণ প্রতিমাতত্ত্ব বুঝাইবার এ স্থান নহে। আপনিও সহজে বুঝিবেন না। তবে এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন, খৃষ্টানদের ক্রশ যেমন খৃষ্টের আত্মবলিদানের নিদর্শন, এ সকল প্রতিমাও এক একটি শক্তির ও সত্যের নিদর্শন মাত্র।

স্মা। কিন্তু এই প্রতিমার প্রয়োজন কি?

অ। ক্রশের প্রয়োজন কি? যে কোনও বিদ্যা লিখিতে হইলেই তাহার অক্ষর চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই। সকল বিদ্যা অপেক্ষা যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববিদ্যা, তাহা শিক্ষা করিতে কি কিছুই চাহি না? হিন্দুদের প্রতিমাগুলি সেই পরম বিদ্যা শিক্ষার অক্ষর, শাস্ত্র তাহার গ্রন্থ, সম্প্রদায় সকল শ্রেণী, এবং পূজা বা সাধনাপদ্ধতি তাহার প্রণালী। এখানে অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের পার্থক্য ও বিশেষত্ব। অন্য ধর্ম্ম শিশু, বৃদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী অভেদে এক। হিন্দুধর্ম্মে অধিকারিভেদে স্বতন্ত্র সোপান আছে। যাহার যেরূপ শিক্ষা,

ও জ্ঞানলাভ হইয়াছে, যেরূপ মানসিক শক্তি আছে, সে সেইরূপ সোপান অবলম্বন করে।

সা। কিন্তু অধিকাংশ লোক নিম্নতম সোপানে থাকিয়া যায়। উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহারা এ সকল পুতুল-কেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।

অ। তাহা নহে। আপনি সামান্য এক জন মূর্খ কৃষক-কেও জিজ্ঞাসা করুন, সেও বলিবে, এতগুলি ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর এক। প্রতিমারা বিভিন্ন দেবতার বা ঐশিক শক্তির প্রতিমামাত্র। লক্ষ্মী ধনদার, সরস্বতী জ্ঞানদার, দুর্গা দুর্গতিহারিণীর, কালী ধ্বংসকারিণীর প্রতিমা। তাহারা মারীভয় হইলে কালী পূজা করে, লক্ষ্মী কি সরস্বতী পূজা করে না। আর অধিকাংশ লোক ত নিম্নতম সোপানে থাকিবার কথা। অন্য বিদ্যায়—দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পেও ত তাহারা নিম্নতম সোপানে। হিন্দু ধর্ম্মের সোপানগুলিও এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহার সকল সোপানে, এমন কি, নিম্নতম সোপানে থাকিয়াও মানুষ সচ্চরিত্র হইতে পারে, নিষ্পাপ হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে। ধর্ম্মের ইহাই ত উদ্দেশ্য। আপনাদের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে, মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু নিম্নশ্রেণী কত শান্ত, শিষ্ট ও সাধু, মনুষ্যত্বে কত উৎকৃষ্ট।

তাহার কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মে হিন্দু ধর্ম্মের মত অক্ষর নাই, অধিকারিভেদে শাস্ত্র নাই, শ্রেণী নাই, শিক্ষাপ্রণালী নাই।

সা। যদি হিন্দুদের উচ্চতম ধর্ম্মশৃঙ্গই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মতভেদ কি লইয়া?

অ। কতকগুলি ছাই ভস্ম লইয়া, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, যুবতীবিবাহ।

সা। এগুলি কি মন্দ?

অ। মন্দ! জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী। প্রত্যেক পুরুষ বিবাহ করিলেও বহুসংখ্যক নারী অবিবাহিতা থাকিবার কথা। তাই ভারতে বহুবিবাহপদ্ধতি আছে। ইহার উপর যদি বিধবারা আবার দুই বার, বহুবার বিবাহ করে, তবে অবিবাহিতা রমণীর সংখ্যা আরও বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিধবারা একবার স্বামী পাইয়াছিল। তাহাদের আবার স্বামী না দেওয়া, কিংবা অন্য রমণীগণকে একেবারে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে না দেওয়া, অধিকতর নিষ্ঠুরতা। তৃতীয়তঃ, এই ভারতে এখনই অন্নজলের জন্যে হাহাকার। আপনারা বলেন, জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। তবে ভারতের লক্ষ লক্ষ বিধবাকে বিবাহ করিতে দিলে কি জনসংখ্যা আরও বাড়িবে না? আপনাদের দেশে জনসংখ্যা নিবারণের জন্যে কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বিত

হয়। আর ভারতের শাস্ত্রকার বলেন, হিন্দুবিবাহ শরীরে শরীরে সম্ভোগার্থ নহে। উহা আত্মায় আত্মায়, ধর্ম্মসাধনার্থ। আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের মৃত্যুতে উহা ছিন্ন হয় না। অতএব বিধবারা মৃত পতির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, জীবন পুণ্যময় করিয়া-যাপন করিলে পরলোকে আবার পতির সঙ্গে অনন্তকালের জন্যে সম্মিলিত হইবে। সাহেব! দুইটার মধ্যে কোনটি মহৎ উপায়?

সা। কিন্তু অসবর্ণবিবাহে দোষ কি? নূতন রক্তের সংমিশ্রণে তাহাতে জাতির উন্নতি সাধিত হয়।

অ। হয়। নূতন সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয়, কিন্তু ভিন্নজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয় কি? ঘোড়ার ও গাধার রক্তের সংমিশ্রণে যে খচ্চর হয়, উহা না হয় গাধা, না হয় ঘোড়া। গাধায় ঘোড়ায় যেরূপ পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে, এবং বৈশ্যে শূদ্রে ততোধিক প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যাহারা জ্ঞানপ্রয়াসী, তাহারা ব্রাহ্মণ, যাহারা যুদ্ধপ্রয়াসী, তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা বাণিজ্য-প্রয়াসী, তাহারা বৈশ্য, এবং যাহাদের এ তিন কার্য্যের কোনটিরই প্রকৃতি ও শক্তি নাই, তাহারা শূদ্র। ভারতে প্রথমে এইরূপ চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। পুরুষানুক্রমে

বিশেষ গুণ ও কর্ম্মের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও সংস্কার এত বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের এক মানবজাতি বলা যাইতে পারে না। এক জন ব্রাহ্মণ আর এই ডোমকে দেখুন। ইহারা কি এক জাতি? এক জন জ্ঞানপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ যদি এই ডোমের কন্যা বিবাহ করে, তাহার সন্তানে কি সচরাচর জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে? ভারতীয় বিবাহের দুইটি উচ্চ অভিসন্ধি। প্রথমতঃ সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ সমজাতীয় দুইটি আত্মার সংমিশ্রণ। এই উভয় সংমিশ্রণের দ্বারাই জাতীয় গুণ ও কর্ম্মের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেবল সবর্ণে বিবাহ হইলে হইবে না। জ্যোতিষের সাহায্যে যথাসম্ভব দুইটি সমধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মার সম্মিলন চাই। আর্য্যবিবাহের সমস্ত প্রক্রিয়াই দুইটি আত্মার বৈদ্যুতিক (Mesmeric) সংমিশ্রণ। উহা বুঝাইবার এ স্থান কি সময় নহে। আর্য্যদের দশকর্ম্মের ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে উহাদের বৈজ্ঞানিকতায়, দার্শনিকতায়, এবং আধ্যাত্মিকতায় অভিভূত হইতে হয়। যাক্ সে কথা। আপনাদের দেশেও অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু এক জন রাজপুত্র কি আপনি, একজন মুচি মুদ্দাফরাসের কন্যা বিবাহ করিবেন কি? ব্রাহ্মসমাজেরও ত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ

মূলনীতি। কিন্তু কয়টি এইরূপ বিবাহ হইয়াছে। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের এক জন ভক্তিভাজন নেতা বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্ম-বিধবা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মের কন্যা চাহে, বৈদ্য ব্রাহ্ম বৈদ্য ব্রাহ্মের কন্যা চাহে। মোট কথা, দুটি মানুষের আকৃতি এক নহে, প্রকৃতি এক নহে। যেখানে ভগবান এইরূপ বৈষম্য ঘটাইয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া সাম্য আনিবে। জলে জল মিশিবে, অনলে অনল মিশিবে। জগতে সর্ব্বত্র সম প্রকৃতিই মিশে। অতএব সমপ্রকৃতিই জাতীয়তার ঈশ্বরাভিপ্রেত ভিত্তি। তাহা মানুষ কেমন করিয়া উড়াইবে? এ জন্য সকল দেশেই একরূপ না একরূপ জাতিবিভাগ আছে। আপনাদের দেশে উহা ধন ও পদমর্য্যাদাগত। আর্য্যদের উহা প্রকৃতিগত। বলুন দেখি, কোন্‌টি অধিক স্বাভাবিক? আর আপনি যে নূতন রক্তের কথা বলিয়াছেন, সেই কথা হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ভুলেন নাই। তাঁহারা বর-কন্যার কয়েক পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া, সমজাতীয় রক্তের নূতনত্বের বিধান করিয়াছেন।

সা। আচ্ছা যুবতীবিবাহ অপেক্ষা কি বাল্যবিবাহ ভাল?

অ। ভাল। তিনটি কারণে ভাল। প্রথমতঃ কি যুবক, কি যুবতী, অবিবাহিত থাকিলে উভয়ের পদস্খলিত হইবার কথা। চরিত্রের বাঁধ, সংযমের বাঁধ, এক বার ভাঙ্গিলে

উহা রক্ষা করা বড় কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ না হইলে কন্যা কিরূপ অবস্থাপন্ন পাত্রের হাতে পড়িবে, তাহা জানা অসাধ্য। ধনীর গৃহের উপযোগী করিয়া দুহিতাকে শিক্ষা দিলে, সে যদি দরিদ্রের ঘরে পড়ে, তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। সেরূপ দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা দিলে সে যদি ধনীর ঘরে পড়ে, অন্ধকারের কীট আলোতে গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহারও সেরূপ হয়। বিবাহ হইয়া গেলে যেরূপ ঘরে পড়িল, তাহার উপযোগী করিয়া পিতা মাতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহার চরিত্র গঠিত করিতে পারেন। যুবতী-বিবাহে এ সুবিধা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা উভয়ের চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে। গঠিত চরিত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করা, প্রস্তরমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া নূতন করার মত অসাধ্য। যুবক যুবতী পরস্পরকে গুণ দেখাইয়া আকর্ষিত করে। পরস্পরের দোষ কখনও প্রকাশ করে না। যৌবনের মোহে নির্ব্বাচনশক্তিও আচ্ছন্ন করে। এই জন্যেই এই দেশে বর-কন্যা নির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতার উপর। কোনও কার্য্যের ভার অদূরদর্শীর অপেক্ষা দূরদর্শীর উপর অর্পণ করা কি সঙ্গত নহে? যৌবনের মোহ অন্তর্হিত হইলে পরস্পরের প্রকৃতি অনাবৃত হইয়া পড়ে। তখন উভয়ের প্রকৃতি যদি বিভিন্ন হয়, বিপরীত হয়, উহা পরিবর্ত্তন করিবার আর সময় থাকে

না। কাজে কাজেই বিবাহবন্ধনের ছেদন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অন্যথা, উভয়ের জীবন ঘোরতর অসুখের হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, একস্থানে একটি বৃক্ষ ও লতার চারা রোপণ করিলে উহারা পরস্পরের উপযোগী হইয়া, কেমন সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু একটি বর্দ্ধিত লতা রোপণ করিলে সেরূপ হয় কি? বিবাহের পর হিন্দুদের বরকন্যা বুঝে, তাহারা এ জীবনের জন্যে সম্মিলিত হইয়াছে; আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। তখন চেষ্টা করিয়া হইলেও, একে অন্যের ভালবাসার পাত্র হইতে চাহে, এবং পরস্পরের সন্নৈকট্য এই চেষ্টার অনুকূল হয়। এরূপে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ, উভয়ের ভালবাসা অন্য কাহারও প্রতি সঞ্চারিত হইবার অবসর থাকে না। এইটি একটি গুরুতর কথা। যৌবনসঞ্চারেই ইন্দ্রিয় সতেজ হইতে আরম্ভ হয়। যদি এ সময়ে কাহারো উপর চক্ষু পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে বিবাহ না হয়, এই প্রেমের ছায়া পতি-পত্নীর মধ্যে একটি আবরণের মত থাকিয়া ঘোরতর অসুখের কারণ হয়। এ সকল কারণেই হিন্দুর বিবাহ এত সুখশান্তিপ্রদ, পতিপত্নীর বিচ্ছেদ অপেক্ষাকৃত এত অল্প।

সা। বালকবালিকার বিবাহের ফলে কি সন্তান নিস্তেজ ও ক্ষীণজীবী হয় না?

অ। হইতে পারে। কই, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। আবহমানকাল হইতে বাল্যবিবাহ ভারতে চলিতেছে। তথাপি এতকাল রাজস্থান, পঞ্জাব, এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত, এমন কি, এ বঙ্গদেশ কি অপূর্ব্ব বীরভূমি ছিল! তদ্ভিন্ন বিবাহ হইলেও যৌবনসঞ্চার পর্য্যন্ত দম্পতীকে স্বতন্ত্র রাখাই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা এখনও প্রচলিত। বঙ্গদেশে শাস্ত্রাজ্ঞা যে সকল সময়ে প্রতি-পালিত হয় না, সেই দোষ শাস্ত্রের নহে।

সা। কিন্তু স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কি ভাল?

অ। পরাধীন দেশে ভাল বৈ কি? আপনারা স্বাধীন, পরাধীনের দুঃখ বুঝিবেন না। পরাধীন পুরুষ শত লাঞ্ছনা নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু পত্নীর লাঞ্ছনা পশু পক্ষীও সহিতে পারে না। ভারত যে দিন হইতে পরাধীন হইয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুদের মধ্যে এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপ্রদেশ তাহার সাক্ষী।

সা। কিন্তু ইহারই কারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না।

অ। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে এই অবরোধপ্রথা আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিন্দু মুসলমান মেশামিশি করিতেছে না? বিশেষতঃ, এই দেশের লোক দরিদ্র। তাহারা

তাহাদের স্ত্রীদিগকে ইংরাজি শিখাইবে, গাউন পরাইবে, উহা তাহাদের সাধ্যাতীত। আপনারা কি আপনাদের মহিলারা কখনও বাঙ্গলা কি দেশীয় ভাষা শিখিবেন না। সামান্য শাড়ী-পরা স্ত্রীলোক দেখিলে, নাক সিট্‌কাইবেন। এরূপ অবস্থায় অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিলে উভয় জাতির সম্মিলনের কি সাহায্য হইবে? ভারতীয় সম্প্রদায়বিশেষ ত উহা উঠাইয়া দিয়াছেন; সম্যকরূপে আপনাদের সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কই, তাঁহাদের সঙ্গে আপনাদের কি খুব মেশামিশি আছে? বরং আপনারা কি তাহাদের জাতিভ্রষ্ট (out caste) বলিয়া অবজ্ঞা করেন না।

* * * *

সা। আর শিক্ষাপ্রণালী?

অ। এই অবাধবাণিজ্য ও মোকর্দ্দামার দাবানলে ইন্ধন যোগাইতেছে ও বাতাস দিতেছে। আগে লেখাপড়াও, শিল্প ও বাণিজ্যের মত, জাতিগত ছিল। রাজ-শাসনে জাতিগত থাকিত। এখন তাঁতির ছেলে, কুমারের ছেলে, কামারের ছেলে, জেলের ছেলে, এমন কি, মেথরের ছেলে পর্য্যন্ত লেখা-পড়া শিখিতেছে। উদ্দেশ্য চাকরি। ইহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য আরও ধ্বংস হইতেছে; যাহাদের লেখা-পড়া পুরুষানুক্রমিক একমাত্র উপজীবিকা ছিল, তাহাদের অন্ন মারা যাইতেছে, এবং আপনারা উমেদারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছেন। আর শিক্ষা-প্রণালীই বা কি! স্বয়ং নৃমুণ্ড-মালিনী কালী! করে এক দিকে ভীষণ পরীক্ষা-খড়গ ও শিশুর সদ্যশ্ছিন্ন শির। অন্য দিকে "সেনেটের" সদস্যদের ও শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষদের জন্যে অভয়, ও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের জন্য বরদ কর। শবরূপী বঙ্গ-দেশের বক্ষে শিক্ষাপ্রণালী তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। যে দেশে পরীক্ষার নাম গন্ধ ছাড়া মহাপণ্ডিতসকলের অভ্যুত্থান

হইয়াছে, সে দেশে প্রায় ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বৎসর বৎসর পরীক্ষা ত আছেই, তাহার উপর ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, আবার "টেষ্ট্" (Test)। পরীক্ষাও আবার এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা। আবার এক সঙ্গে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, শিশুর সাধ্য নাই যে, একত্র বহিয়া লইয়া যায়। তাহাতে নাই, এমন বিষয়ই নাই। ১০।১২ বৎসরের শিশুকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, না শিখিতে হয়, এমন তত্ত্ব নাই! কেবল নাই অনাবশ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব। তাহাদের খেলা নাই, পুস্তকের চাপে খেলার কথা দূরে থাকুক্, অবসর পর্য্যন্ত নাই। আমোদ নাই, উৎসব নাই। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয় স্বাস্থ্যতত্ত্বের বহি পড়িয়া। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ের নূতন পুস্তক কিনিতে হইবে। তাহা না হইলে শিক্ষা-বিভাগের নিজের ও আত্মীয়ের অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক সকল বিক্রয় হইবে কিরূপে? ইহাই এখন শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব সকল আবার গলাধঃকরণ করিতে হইবে বিদেশীয় একটি জটিল ভাষায়। একখণ্ড মাটির চারিদিকে জল থাকিলেই দ্বীপ বলে,—এ কথা শিশুকে বলিলেই সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। তাহাকে এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া মুখস্থ করিতে হইবে—Island is a

piece of land Surrounded by water. ইহার একটি অক্ষরও সে বুঝে না। দ্বীপ কি, তাহা বুঝা দূরের কথা। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অনেক দিন হইল স্কুল ও কলেজ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছিলেন তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। সেখানে শিশুরা নানাপ্রকার স্তব কণ্ঠস্থ করিত, নানারূপ ধর্ম্মোপাখ্যান শিখিত। অক্ষর লিখিতে শিখিলেই দেব-দেবীর নাম লিখিতে শিখিত, এবং গৃহে গৃহে সেই দেব-দেবীর পূজা দেখিত। এইরূপে দেবভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হইত। দেব-দেবীর নামের পর আপনার পিতা-মাতার, আত্মীয়স্বজনের নাম লিখিতে শিখিত। তাহাদের পিতা-মাতার কাছে পরমপূজনীয় ও সেবক-সেবকাধম পাঠে পত্র লিখিতে শিখিত। পূর্ব্বপুরুষের নাম শিখিত, তাহাদের কাহিনী শুনিত। এইরূপে গুরুজনের প্রতি ভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত। এখন পাঠশালাতেও ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ, এবং পিতার কাছে ইংরাজি স্কুলের ছেলে বাঙ্গলায় পত্র লিখিতে হইলেও লেখে, "মাই ডিয়ার ফাদার।" আর সুশিক্ষার বাকি কি? ইহাতে না আছে ধর্ম্মশিক্ষা, না আছে কর্ম্মশিক্ষা। দু' পাত ছাই ভস্ম পড়িয়া আপনার ব্যবসার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ; কামার, কুমার, তাঁতি, সকলেই চাহে—চাকরী,

ডাক্তারী, উকিলি, মোক্তারি, অধিকাংশ টন্নিগিরি। এক একটি পাপিষ্ঠ অর্থপিপাসু উকিল, মোক্তার, টন্নি যেখানে আছে, মোকর্দ্দমার চোটে তাহার আশে পাশে দূর্ব্বা গাছটি পর্য্যন্ত গজায় না। কালে কালে এই শিক্ষার ফলেও দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। অন্নজলের হাহাকার উঠিতেছে। দেহ খর্ব্ব হইতেছে, আপনারা এই বীরভূমিতে সামান্য সৈন্যের যোগ্য লোক পাইতেছেন না। আত্মা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে, —দেশে প্রকৃত পণ্ডিত জন্মিতেছে না।

সাহেব নীরব, স্তম্ভিতভাবে স্থিরনয়নে সমুদ্রের সান্ধ্য-শোভায় চাহিয়া রহিয়াছেন। ভানুমতী চরণতল হইতে বলিল, "বাবা! ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?"

অ। এই ত্রিদোষের প্রতিকার আছে। রাজা সহজে প্রতিকার করিতে পারেন। অবাধবাণিজ্য উঠাইয়া দিয়া কিংবা স্থানে স্থানে রাজভাণ্ডার হইতে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পীর অন্ন যোগাইতে পারেন। পূর্ব্ববৎ, গ্রামবাসীর দ্বারা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করাইয়া ফৌজদারি, দেওয়ানি মোকদ্দমার ভার তাহার হস্তে দিতে পারেন। শিক্ষাপ্রণালী পূর্ব্ববৎ সরল, সহজ, স্বাভাবিক করিয়া, সম্প্রদায়বিশেষে স্বেচ্ছায় যেরূপ সংস্কৃত ও আরব্য-ভাষা শিক্ষা দিবার বিধান করিয়াছেন, সেরূপ ছাত্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষারও বিধান করিতে পারেন।

আর পারি আমরা। পারে একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। পারে ধর্ম্ম ও জাতিবিদ্বেষহীন একটি মাতৃসেবক প্রকৃত সন্ন্যাসিসম্প্রদায়। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম্মের সঞ্জীবনী-সুধায় গ্রামবাসীর হৃদয় আর্দ্র করিয়া, আমার সেই ধর্ম্মমণ্ডলী বা পঞ্চায়েত এবং সেইরূপ পাঠশালার সৃষ্টি করুন, এবং স্বদেশীয় শিল্প ব্যবহার করা এবং এই পঞ্চায়েতের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, গ্রামবাসিদের প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিউন। আপনার ভাল মন্দ বুঝাইয়া দিলে বুঝে না, এরূপ মানুষ নাই। এইরূপে গ্রামে গ্রামে বুঝাইয়া দিলে আমাদের দেশের লোকেও, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, বুঝিবে।

সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং অনাথনাথের করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইয়া বলিলেন, "অনাথবাবু! বলা বাহুল্য, আপনার সঙ্গে আমি সকল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অনেক বিষয় আমি বুঝিলাম, এবং চিন্তা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয় পাইলাম। ইহার জন্যে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

একাদশ অধ্যায়।

মহামুনি।

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য-অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর-পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন; এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে স্থানান্তর হইতে প্রজা সমাগত হইতেছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ

হইতেছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিয় এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত, স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। তিনি আত্মসংযমবলে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে শূন্য হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব?

আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।” ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালক বালিকা,—তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি ‘মা’ বা ‘দিদি’ সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—“তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস্!” অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানা রূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত করিয়া, তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস; পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল; তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীলগর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী

গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকা-খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবান্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। বিস্তীর্ণা কর্ণফুলীর

—"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাক্ষেত্র। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত ও সমতলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। অনাথনাথ বাটী ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলার আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসী"র এক জন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব ;—

"মহামুনি চট্টলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই

এই মেলা মিলিয়া থাকে । এ দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল উপত্যকায় নানা স্থানে বৌদ্ধ-ভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে । বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতরপ্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে! * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান! কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই! এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত। নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণ-মূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন! বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি ; এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা ফুরায়,

দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে! আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল দোকানেই মহা ভিড়; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাটমূর্ত্তি। ইহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাটরূপে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দেখিলাম, ৭।৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুড়ান—দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।”

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তিনি এই মেলার সাহায্যার্থ, বুদ্ধ দেব ও বৌদ্ধদের সেবার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্ণে মেলাস্থলে আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত

উপবন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। যত দূর দেখা যাইতেছে, নানা পর্ব্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত ; তাহাদের গীতে, হাস্যে ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, 'বউ কথা কও' নাগেশ্বরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিনাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। পার্ব্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মস্তকে সম্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘনকৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

"সকলেরই এক বেশ। মগপুরুষের মাথায় রেশমী রুমাল, গায়ে কুর্ত্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙ্‌টি! তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। মগমহিলাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ফুলের তোড়ায় সুশোভিত ; বক্ষঃস্থল একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে রেশমী শাড়ী, গলায় টাকার মালা ; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়না। ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুরুল পুরু রৌপ্যখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয়। মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের দেহমন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষেরা সকলই বলশালী ও কর্ম্মঠ; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ

সকলেরই নাসিকাটি চাপা। মগেরা বড় আমোদপ্রিয়। নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে; অথচ মুখে নির্ম্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বুদ্ধদেবকে পূজিতে যাইতেছে। অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জানু রাখিয়া ললাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। অলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাভরণা, স্বর্ণপ্রতিমাস্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিতনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল, অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ-উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসবক্ষেত্রের এক নির্জ্জনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলায় কোমল মকমলসন্নিভ

শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা! ওই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ সকলেই কি আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেথানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুথান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেথানে জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিল-বস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যা-

ম্বিকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ-নির্ব্বাণের উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচার, তিরোধান, ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধানকাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবা! আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।"

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়! এখানকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম; শিখে,—না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপ-

ন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতিযোগিতা। যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ২॥০ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দুবৈরাগী। তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে, যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে "ক্রশে" নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইঁহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন ?

অ। না ; শ্রীভগবান এক,—কেবল সাধনার পথ প্রকৃতি-ভেদে স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি মা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে ষড়্ রসের কথা কি শুনিয়াছ ?

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, কান্ত, মধুর।

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসাশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতামাতার মত প্রেম করে। হিন্দু দেব দেবীরা পিতা মাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতা মাতার দাস কোন্ পুত্র নহে ? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস। শ্রীদাম সুদাম যেরূপ করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজগোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎপতিকে সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপে-

ক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয় ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়াছিল। এই অবস্থা হিন্দু যোগীর 'সোঽহং' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। এরূপে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, মানুষ তদনুরূপ রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম্ম একটি সাধনার পথমাত্র—গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্ম্মপথ, অপর ধর্ম্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন ;—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারি দিকের শ্যামল গিরিরাজি দূর সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার

কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের একবিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও উছলিয়া উঠিল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন ৺শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেব-বালা! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশভূষাই বা কোথায়? অজে আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশ-ভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে!"

"যুবতীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালকগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর একবার আনন্দে

উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির-প্রাঙ্গন বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে, রাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও, প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলার এমনই মহান ভাব!"

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন? হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রজলীলা।

সুন্দর বৈশাখ মাস, সুন্দর সুনীলাকাশ,
কি সুন্দর বহিছে মলয়,—
শান্ত সুশীতল!
কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা,
উপত্যকা তরুশোভাময়,—
সুন্দর শ্যামল!
সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে
নীলাকাশে শ্যামল ধরায়,—
কি হাসি সুন্দর!
যুবতী পার্ব্বতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,
সরলার হাসি নিরমল,—
প্রাণ স্নিগ্ধকর।
সে যূথিকা হাসি মাথি শোভিতেছে কর্ণফুলী
পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে,
মালা মালতীর।

পার্ব্বতীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী
কি তরল সুধা নিরমল,—
কি শান্ত গভীর!

অনাথনাথ ও ভানুমতী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুল্লচন্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাভূমির শীর্ষস্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষঅন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণালোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে, গুল্মে ও তৃণে সমাবৃতা পার্ব্বত্য ও সমতলভূমি জ্যোৎস্নালোকে কি মনোহর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে! এই শ্যামক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কর্ণফুলীর কি নয়নানন্দকর বঙ্কিমগতি! শ্যামার ও শ্বেতভুজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে! গিরিশেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উদ্যান চন্দ্রকরে খণ্ড-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণবসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সেই কৌমুদী-প্রোদ্ভাসিত শোভা কল্পনাদুর্ল্লভ। অট্টালিকার ছাদের টবে নানাজাতীয় ক্রোটন, ফুল ও

লতার মনোহর উদ্যান ও নিকুঞ্জ স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নায় একটি স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, মানবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে ; যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানব-হৃদয় তাহার মত জ্যোৎস্নাবিধৌত শ্বেতনির্ম্মলকান্তি ধারণ করিলে তবে নির্ব্বাণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' এবং ভানুমতী তাঁহার পদতলে আরক্তমকমলমণ্ডিত 'ফুটষ্টুলে' বসিয়া স্থির-চিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সরিৎমালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও বিগত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়া। উভয়ের মুখ প্রশান্ত ; অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিষাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছু ক্ষণ স্থিরনয়নে এই শোভা দেখিয়া, এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—"মা! আমি স্থির করিয়াছি, তোকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিব।"

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা! বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণে শাস্ত্রমতে গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের মেয়ে নও, বৈরাগীর মেয়ে। সকলে বলিতেছে, তুমি কোনও শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। এত রূপ, এত গুণ, এরূপ চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক ভাষায় জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোনার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে, শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন

বলিয়া, আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম। যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচট্টল গান্ধারে যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস

পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশে যে সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নিগু´ণ, নিরাকার ;—বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার। পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। ঘোরতর মদ্যমাংসাশীও হিন্দু এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দু-ধর্ম্মের মূল কি ? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই ? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াপদ্ধতিসহ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ণভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত ; সর্ব্বত্র উক্ত

পদ্ধতি এবং বর্ণধর্ম্মানুসারে অল্পাধিকপরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্মের দ্বারা সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ কাপড় বুনিবে, এক জন মহাপণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করিয়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু তাহা হইলেও কোনও রূপ সামাজিকপদ্ধতি যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন

আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের মূল এই ত্রিনীতি বা মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে। আর দেশে থাকিয়াই কোন্ হিন্দু ইংরাজ মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাহারা বিলাত

কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু বাবা! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনত মুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

সুখ যাহা বল কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
ওই আকাশের নীলিমার মত
দুঃখ(ই) জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা সুখ কি তাহা

কখনও জানে নাই,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে ত সেরূপ কোনও ভাব নাই। সে স্থির গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে; গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল! কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে, কেহ তৃপ্ত হইয়াছে, সুখী হইয়াছে,—এ কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।"

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন।

ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজিওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের সময়ে 'নবযৌবনের' মেলার দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-

দেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বস্থ একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জলস্রোতের মত ভারতের নানা-দেশীয় যাত্রীর স্রোত জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি ষোড়শী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।" তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে, তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বলি-লাম,—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—"আমি বড় অভাগিনী। আমার ভাগ্যে জগন্নাথ-দর্শন ঘটিল না।" এক জন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞামতে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে শববৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে

লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত স্থির নির্নিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অতৃপ্ত-নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অন্বেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনের জন্যে ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী এরূপভাবে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুতকর্ম্মা ও দৈব-শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শারীরিক বলে এত অসুরের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়া-ছিলেন,—সেই 'সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে, ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে অধীরা

হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধদেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্যদেব কি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? তবে সরলা ব্রজগোপীরা স্বয়ং যে শ্রীভগবানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যে পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে এক জন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিলে গ্রামবাসিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না? বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোরমাত্র; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ।

আর একদিন আমি কার্য্যস্থান হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসি-শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জল-খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে। তখন আমার মনে হইল যে, একটি মূর্খ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে? কালে যমুনাতীরাভিনীত এই সরস ও সহজ,

যমুনার সলিলের মত নির্ম্মল, শীতল ও মধুর ধর্ম্মও আবিল ও পঙ্কিল হইল। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও গৌরীয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। হইবারই কথা; শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আহা! কি করুণ মধুর লীলা! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দযশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ষড়রসভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বড় কঠিন।

যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।" ব্রজের গোপ গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, এরূপে তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্ম্মপথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃত পথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম, সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে প্রভুর মত, পিতার মত, পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটি গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্ম্যশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়!
রাসে তোরা কে নাচিবি আয়!

ওরে চন্দ্র নাচে, তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি,
গ্রহে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী,
বুদ্ধ হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
পত্নীপুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,
দুই নেত্র ছল ছল,
মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল
নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়,—
নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায়।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,
প্রেমে হাসে যমুনা,
প্রেমে হাসে বৃন্দাবন,—নাহি উপমা।
নীলমণিধারাপ্রেমে যমুনা উছলি যায়।

৬

আহা আছেন ঈশ্বর
বিরাজিত নিরন্তর
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে, কৃষ্ণ রাসেশ্বর।
রাসচক্রে সর্ব্বভূত প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,
প্রেমের গোপী আমরা,
কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা;
জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি ভব রাসলীলায়,—
(নাথ!) নবীনের নাহি দুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়।

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী বৈশাখী জ্যোৎস্নায়

পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাইতেছে, এবং তাহার কপোলযুগল বাহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। অনাথনাথ ভাবিলেন,—"আমি কি তবে ভ্রান্ত ?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিজয়া।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমেষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্ত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জমিজারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর, শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তি-ছায়া পাইয়াছেন; কি যেন এক সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চিরঅভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে

রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার এক জন প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখদুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিত। সকলের মুখে সেই এক কথা,—"মা! তুই কোন দেবকন্যা?" সেও জাতিনির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত, এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করিত। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয়।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য করিতেন। তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন, পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই; কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল

করিয়া সেরেস্তার কাগজপত্র গোছাইয়া লইতেছেন ; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কিংবা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোনবৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে, উপলখণ্ডে কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে ; সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন ; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার

বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাইতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা!
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন;
বদনের ভূষণ আমার সে নাম কীর্ত্তন।

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে; ফুল্ল-জ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যামনামে মুখরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি? তিনি উঠিয়া উদ্‌ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে

গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত. না জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজায়ার তীরে উহা আরও কত সুন্দর! অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তি-স্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি

প্রতিকৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্ত-সলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম পরশমণির' দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথনাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই পুণ্যতিথিতে আমার পূর্ব্ব-পুরুষের এই পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রুনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে

হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, “যে কর্ম্মচারীটি মারিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবারপ্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।” কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি ‘তুলট’ কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

“শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালী গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময়

আমি ও আমার বৈরাগিনী যে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছ দিয়া একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সে সময়ে ৺পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাঁহার দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জীবিত করেন। আমার বৈরাগিনী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিনীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৺পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা।

কোনও মহৎ কার্য্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্য-র্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমি মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজকিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিনী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রীহরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি

১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস
শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া "ভানুমতী আমার অমিয়া! মা অমিয়া! মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে

প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। পুরীতে মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, দাস দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলেরই মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কলরবে, বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে বহিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় ভানুমতী কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল

হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদীতীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গলদশ্রু-নয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতায়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবন-সদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুৎবেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা

ও বৈরাগিনী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল স্বর্ণ। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিনী মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়—কাঁদিতাম, পিতার সমুন্নয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান; বলিয়াছিলেন,—মা! তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেবকন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বন্যার আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিস; আমরা মহা-পাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান। বৈরাগিনী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু

শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া, আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে একদল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোন গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার জাতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা

হইলাম। বেদিনী মাতা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও, বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। তখন আমার নাম হইল—আশা। সর্ব্বশেষ তাহাদের শিশু পুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহার আদরে আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে স্বর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শন লাভ করি। দর্শনমাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা।, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণতলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি; কত লোক কতরূপ স্নেহ মমতা দেখাইয়াছে; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্র আশ্রয়দাতা দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি' লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী

দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুল-টিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্যে কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সংবাদ শুনিলাম, তোমার স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম! সর্ব্বশেষে আমি পথের ভিখারিণী রাজনন্দিনী,—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।

কিন্তু বাবা! বৈরাগিনী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার ওই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? যে জীবনলতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা! এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-দুর্ল্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া

তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি উহার ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য সুখ স্থান পায় না।

"হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেবদেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি! বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন।

আমি উহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বাল-গোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। উহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব ৬পুরী গোস্বামী আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহার কাছে আদিনাথে গিয়াছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন

করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন, আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার।' উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি দিয়া পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়ত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তিবিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে; বালকবালিকাগণের জন্যে সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অনাথনাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি সন্ন্যাসী ও আতুর নিরন্নের সেবা হইবে।

৫। আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরু-দেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশ-মতে সেই পবিত্র স্থানে মহামহীরুহ অশ্বথের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল' নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ-শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক ভারতের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে, যেন সাধু বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বী-দের সেবা হইবে। সমুদ্রপ্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়ভাণ্ডার' হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্রতিকৃতি থাকিবে।

বাবা! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমারা পিতাপুত্রীর,—মাতাপুত্রের,—আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রয়ে চলিলাম। তুমিও আসিও। বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। তপস্যা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাহার দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা
"ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠ সমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি; তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়াশ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল'; মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

কক্ষে আলনার উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।